রত্নমালা নস্কর
বাংলা বিভাগ
পিএইচ.ডি

বাংলার পির-গাজি-বিবিকেন্দ্রিক নির্বাচিত মাহাত্ম্য-কাহিনিমূলক গ্রন্থ: শিল্পরূপ ও তুলনামূলক পর্যালোচনা

মৌখিক পরম্পরায় প্রচলিত পির-গাজি-বিবির কাহিনিগুলি লিখিত হওয়ার পর সেগুলি বিস্তৃত আকারে পাওয়া গিয়েছে এটি আমাদের পরম প্রাপ্তি। এই সমস্ত গ্রন্থগুলি পুথি, পাঁচালি, জহুরানামা, কেচ্ছাকাহিনি প্রভৃতি নাম নিয়ে প্রান্তীয় সাহিত্য বা আঞ্চলিক সাহিত্য হিসেবে একটি গুরুত্ব বহন করে আসছে দীর্ঘকাল ধরে। এগুলি ভক্তরা সংগ্রহ করে নিজেদের ধর্মীয় পিপাসা পূরণ করে।

'পুথি' নামকরণের মধ্যে দেখা গিয়েছে পির-গাজি-বিবির জন্মের নানা কাহিনি দিয়ে শুরু হয়ে সমাজে নিজেদের প্রতিষ্ঠার কথা বিবৃত রয়েছে। জহুরানামা নামকরণের মধ্য দিয়ে অলৌকিক শক্তি, ঔজ্জ্বল্য, মাহাত্ম্য প্রকাশ পেয়েছে।[১]

কয়েকটি মুদ্রিত কাহিনিকে অবলম্বন করে গবেষণা অভিসন্দর্ভের আলোচনা অগ্রসর হয়েছে। সেগুলি হল-

মরহুম মুনশী মোহম্মদ খতের সাহেব প্রণীত *বোন বিবী জহুরা নামা* (রচনাকাল- ১২৮৭ সাল)

আব্দুর রহীম সাহেবের *বোনবিবি জহুরা নামা কন্যার পুথি* (রচনাকাল- ১৩০৫ সাল)

আবদুর রহিম সাহেবের *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি* (রচনাকাল- ১২৬০ সাল)

খোদা নেওয়াজের *পীর গোরাচাঁদ* (প্রকাশকাল অজ্ঞাত),

যেসব সত্যপিরের মুদ্রিত কাহিনি এবিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে সেগুলি হল-

মুন্‌শী ওয়াজেদ আলির লেখা *সত্য পীরের পুথি,*

শ্রী কবিবল্লভের লেখা *সত্য-নারায়ণের পুথি* (১৭১৬ খ্রি.)

কৃষ্ণহরি দাস রচিত *সত্যপীর ও সন্ধ্যাবতীর পুথি* (মধ্যযুগের পাঁচালিকার)

দ্বিজ রামধন রচিত *সত্য নারায়ণের পুথি,* (পালা সমাপ্ত-সন ১১৬২ সাল ১৮ই বৈশাখ),

পূর্বে পির-গাজি-বিবিকেন্দ্রিক নানা ইতিহাস গবেষণার অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। কিন্তু এই সমস্ত দেবদেবীকেন্দ্রিক গ্রন্থের আলোচনা সেভাবে হয়নি। এই গবেষণা অভিসন্দর্ভে সেই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে- কবি পরিচিতি, গ্রন্থ পরিচিতি, নামকরণ প্রসঙ্গ, কবি ব্যক্তিত্ব, সমসাময়িক সমাজে মুদ্রিত কাহিনি বা গ্রন্থগুলির গুরুত্ব, পূর্ববর্তী গবেষকদের গবেষণার পরিধি তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে- কাহিনি ও চরিত্রের বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে নারীপুরুষের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ, আকাঙ্ক্ষা, নৈরাশ্যের কথা উঠে এসেছে। এছাড়া সমাজভাবনা, ইতিহাস চেতনা, জীবনবোধ উঠে এসেছে। কাহিনিগুলি লোকশিল্পীর হাতে পড়ে কীভাবে জনসমাজে পরিবেশিত হয় তা দেখানোর চেষ্টা রয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে- মধ্যযুগ, আধুনিক যুগ, রূপকথাধর্মী সাহিত্যের সঙ্গে মাহাত্ম্য কাহিনিগুলির সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্য দেখানো হয়েছে। মুসলমান কবি হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের লেখায় কীভাবে পৌরাণিক সাহিত্যের প্রভাব পড়েছে তার ইতিহাস অনুসন্ধানের চেষ্টা রয়েছে। তৎকালীন সমাজ কীভাবে কাহিনি নির্মাণে সহায়তা করেছে সেই চিত্র অঙ্কিত হয়েছে চতুর্থ অধ্যায়ে। সেখানে সমাজ এবং কাহিনি একে অপরের পরিপূরক হিসেবে দেখা গিয়েছে। ভাষার ক্ষেত্রে বিশেষ বৈচিত্র্য লক্ষ করা গিয়েছে। এই নিবন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে তা আলোচনা করা হয়েছে। আঞ্চলিক সাহিত্যের গুরুত্ব এবং মূল্য বোঝা যাবে এই সমস্ত বিষয় আলোচনার মাধ্যমে। নিম্নে এই বিষয়গুলি খুব সক্ষেপে বর্ণিত হল।

কবিগণ লৌকিক দেবদেবীদের প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের তুলনায় সাহিত্য সৃষ্টি, গ্রন্থের পরিমাপ, এবং পাঠকের ভালোলাগার বিষয়ে সর্বদা সজাগ ছিলেন। শিল্পের প্রয়োজনে পয়ার এবং ত্রিপদী ছন্দে রচিত কাহিনিগুলিতে গান কিংবা ধুয়ার ব্যবহার রয়েছে। সেখানে রাগ কিংবা তালের উল্লেখ আছে। চরণের শেষে অন্ত্যমিল ঘটানোর চেষ্টা করেছেন। বাংলা ভাষার পাশাপাশি আরবি, ফারসি, উর্দু, তুর্কি বিভিন্ন ভাষার শব্দের সংমিশ্রণ লক্ষ করা গিয়েছে। অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকের শুরুতে লেখা হলেও দু-একটি জায়গা ছাড়া ইংরাজি শব্দের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়নি। ভাষায় সাধু ও চলিতের একত্র সমাবেশ রয়েছে। তাঁরা বিভিন্ন আঞ্চলিক শব্দের প্রয়োগ

করেছেন। বিষয়বস্তুর মধ্যে অনেক শব্দ বা পদ আপাত দৃষ্টিতে বানান ভুল জনিত ত্রুটি বলে মনে হবে। আসলে ঐ সময়ে এইরূপ উচ্চারণের পৃথকতা ছিল বলে অনুমিত হয়। সাধারণ মানুষের মুখের ভাষার দৃষ্টান্ত এগুলি। যেমন- জেহেল খানায়, কেলশে, হশ হারা, হসরেতে, ছেপাই প্রভৃতি।

অষ্টাদশ শতকের শেষের দিক থেকে হিন্দু দেবদেবীর মাহাত্ম্য কাহিনি মুসলমান পির পিরানির কাহিনির মধ্যে প্রবেশ করেছে।[২] সন্তজীবনী সাহিত্যে অলৌকিক কাহিনির মতো পির-গাজি-বিবিদের জীবনের নানা ওঠাপড়া রয়েছে। দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হবার পাশাপাশি তাঁদের মানবিকরূপও বর্ণিত হয়েছে। কাল্পনিক বিষয়বস্তুর মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছে বাস্তবতা। সেখানে দেখা গিয়েছে ইসলাম ধর্মের বিস্তার। যেমন- বীরত্ব দেখিয়ে, ভয় দেখিয়ে, ধনদৌলত দান করে, যুদ্ধে জয়লাভ করে হিন্দু রাজার কন্যাকে বিবাহের মধ্য দিয়ে, কেরামতি দেখিয়ে। সেখানে কবিদের পর্যবেক্ষণ শক্তি, অভিজ্ঞতা ধরা পড়েছে। কয়েকটি গ্রন্থের নির্দিষ্ট সন-তারিখ পাওয়া যায়নি। তবে গ্রন্থের সার্বিক দিক বিচার করে মধ্যযুগেরই গ্রন্থ বলা যায়।

পির-গাজি-বিবির মাহাত্ম্য কাহিনিগুলি পালাগান, নাটক, যাত্রা, কাওয়ালি ঢঙে জনসমাজে পরিবেশিত হয়। অনেক সময় পাত্রপাত্রীর চরিত্র অনুযায়ী পালাগায়ক আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার করে থাকেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ এগুলিতে অংশগ্রহণ করেন এবং শোনেন। দেবীর মাহাত্ম্য গাইতে গিয়ে অনেক অপ্রাসঙ্গিক গালগল্প, পুরাণের নানা প্রসঙ্গ তাঁদের কথায় চলে আসে। মুসলমান কাওয়ালগণ বিভিন্ন পিরপিরানির দরগায় বিশেষ অনুষ্ঠানে কেচ্ছা-কাহিনিগুলি কাওয়ালি ঢঙে গান করে।

মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীদের নিয়ে করা গানের মতোই পির, ফকির, বিবির গানগুলি গাওয়া হয়েছে। তাই তাদের গুরুত্ব কমেছে। জনপ্রিয়তা হ্রাসের অন্যান্য কারণ হিসেবে বলা যায় পালাগায়কদের সামাজিক মর্যাদা থাকলেও অর্থনৈতিক ভাবে অনেক পিছিয়ে। ১৯৪৬-এ ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের ফলে গ্রন্থ লেখা এবং পালাগান পরিবেশনে ছেদ পড়ে বলে মনে করা যায়। বর্তমানে মানুষ জীবিকার সন্ধানে শহরমুখী হচ্ছেন। দূরদর্শন কিংবা মোবাইল ফোনের কারণে মানুষ তাদের সময় সুযোগ মতো সিরিয়াল দেখেই সময় কাটায়।

মধ্যযুগের সাহিত্যের সঙ্গে পির-গাজি-বিবিকেন্দ্রিক মাহাত্ম্য-কাহিনিগুলির সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য উভয়ই খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। সাদৃশ্য বিষয়গত ও গঠণগত উভয়ই। মঙ্গলকাব্য রচনা

মিশ্রসংস্কৃতির মেলবন্ধনের ফল। নিম্নবর্ণের এবং উচ্চবর্ণের হিন্দুদের দেবদেবী মিলেমিশে এক হলে বাংলা সাহিত্যে আবির্ভাব হয়েছে মঙ্গলকাব্যের যুগ। জহুরানামা রচিত হওয়ার আরেক ভিন্ন চিত্র লক্ষ করা গিয়েছে। মুসলমানরা এদেশে এসে মানুষের মধ্যে পোশাক, খাদ্য, সংস্কৃতির বিনিময় হয়েছে। হিন্দু ইসলাম জাতি গভীর ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হলে বনদেবী হয়েছেন বনবিবি, সত্যনারায়ণ সত্যপির, মানিকপির শিবেরই ছদ্মবেশ, মৎস্যেন্দ্রনাথের ইসলামি প্রতিরূপ হল পির মছন্দলি।

মঙ্গলকাব্যের মতো কেচ্ছা-কাহিনিতে দাম্পত্য কলহ, যুদ্ধ, সমরসজ্জা, দেবীর ছদ্মবেশ ধারণ, নায়ক ও নায়িকার রূপ বর্ণনা রয়েছে। উভয় সাহিত্য গ্রাম বাংলায় সৃষ্টি ও বিকাশ। নাগরিক জীবনের সঙ্গে গ্রন্থগুলির যোগ নেই। সেখানে পারিপার্শ্বিক সমাজজীবন যেমন উঠে এসেছে তেমনি অলৌকিক কাহিনিতে পূর্ণ। ডক্টর গিরীন্দ্রনাথ দাস ‘পীর মঙ্গলকাব্য’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন।[৩] কারণ উভয় কাব্যই পাঠ করলে বা শ্রবণ করলে পাঠক এবং শ্রোতার মঙ্গল হয়। বৈসাদৃশ্যও খুঁজে পাওয়া গিয়েছে, সেগুলি নিম্নরূপ-

১. মঙ্গলকাব্যগুলি যেসব দেবদেবীকে নিয়ে গড়ে উঠেছে তারাই বড়ো হয়ে উঠেছেন। পির-গাজি-বিবিকেন্দ্রিক কাহিনিগুলিতে সর্বদা আল্লার মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে।

২. পির-গাজি-বিবি মানবীর গর্ভে জন্মলাভ করেছেন। মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীরা দেব সন্তান।

৩. নারায়ণ দেব, বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাস, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী মনসার স্বপ্নাদেশ লাভ করে কাব্য লিখেছেন। কেচ্ছা-কাহিনিগুলিতে এমনটা হয়নি। কয়েকটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম রয়েছে যেমন- দ্বিজ রামধনের *সত্যনারায়ণের পুথি*।

৪. ওসমানিয়া ও গওসিয়া লাইব্রেরি থেকে মুদ্রিত পির-গাজি-বিবিকেন্দ্রিক মাহাত্ম্য গ্রন্থগুলিতে কাব্যের কাহিনি শুরু হয়েছে গ্রন্থের পিছন দিক থেকে। মঙ্গলকাব্যে এমন দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে না।

৫. মঙ্গলকাব্যের তুলনায় কেচ্ছা-কাহিনিগুলিতে আরবি, ফারসি, হিন্দি ও তুর্কি শব্দের বহুল ব্যবহার দেখতে পাওয়া গিয়েছে।

৬. মঙ্গলকাব্যের চারটি খণ্ড- বন্দনা, গ্রন্থ উৎপত্তির কারণ, দেবখণ্ড, নরখণ্ড। মুদ্রিত কেচ্ছা-কাহিনিগুলিতে এইরকম খণ্ড বিভাগ নেই।

৭. মনসাকে তার পুজো পেতে অনেক ছলাকলার আশ্রয় নিতে হয়েছে। তাই মঙ্গলকাব্যে দেবতার সঙ্গে মানুষের বিরোধ অনেকটা বেশি। অন্যদিকে মা বনবিবির বাহুবলই যথেষ্ট ছিল ভক্তদের মনে স্থান করে নিতে। অন্যান্য পির-গাজি-বিবির ক্ষেত্রে একই বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা গিয়েছে।

৯. মঙ্গলকাব্যের মতো কেচ্ছা-কাহিনিগুলিতে শাপভ্রষ্ট প্রসঙ্গ নেই।

১০. পির-গাজি-বিবিকে কেন্দ্র করে একাধিক কবির নাম পাওয়া গেলেও মঙ্গলকাব্যের তুলনায় তা স্বল্প। মঙ্গলকাব্য রচয়িতারা তাঁদের পূর্ববর্তী কবিদের নাম লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁদের কাব্যে।

মঙ্গলকাব্যগুলির মতো মুদ্রিত কেচ্ছা-কাহিনিগুলি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বড়ো স্থান দখল করতে পারেনি।

মুসলমান কবির লেখা পির-গাজি-বিবিকেন্দ্রিক সাহিত্যে পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতের প্রভাব পড়েছে। অনুমান করা যায় মুসলমান শাসনকালে রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের চর্চা হওয়ার কারণে মুসলমান কবিগণ সেইসব কাহিনি জেনেছেন। ধর্মসমন্বয়ের কথা ভেবে হিন্দুদের জাতীয় কাব্যের বিভিন্ন গল্প ও চরিত্র নিয়ে এসেছেন। কবিদের ধারণা পুরাণের কাহিনির সঙ্গে পির-গাজি-বিবিকেন্দ্রিক কাহিনি মিলিয়ে দিতে পারলে তাঁদের গ্রন্থগুলিও জনপ্রিয়তা লাভ করবে। অনুমান করা যেতে পারে মুসলমান কবিদের পূর্বপুরুষ হিন্দু ছিলেন তাই তাঁদের পুরাণের প্রতি আগ্রহ লক্ষ করা গিয়েছে। তবে কবিদের কাব্যরচনায় মৌলিকতা রয়েছে। এছাড়া *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি*-র সঙ্গে নাথ সাহিত্যের কাহিনিগত সাদৃশ্য খানিকটা লক্ষ করা গিয়েছে। তারই ভিত্তিতে এই সাহিত্যের প্রসঙ্গ এখানে এসেছে।

কেচ্ছা-কাহিনিগুলিতে রূপকথাধর্মী অবাস্তব কাহিনির হদিশ আমরা পেয়ে থাকি। চরিত্রগুলির জীবনের সঙ্গে অবাস্তব কাহিনি মিশে রয়েছে। ভাগ্যবিড়ম্বিত জীবনের সমাপন কাহিনির পরিসমাপ্তিতে। কিছু বৈসাদৃশ্যও খুঁজে পাওয়া যায় যেমন-

ক) ভাষার ক্ষেত্রে উভয় সাহিত্যে পার্থক্য রয়েছে। পির সাহিত্যে বাংলা শব্দের পাশাপাশি আরবি, ফারসি, উর্দু, আঞ্চলিক শব্দের আধিক্য রয়েছে।

খ) দুই সাহিত্যের পাঠক ভিন্ন। পির-গাজি-বিবির মাহাত্ম্যকেন্দ্রিক সাহিত্যগুলি সেই সমস্ত মানুষের কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য যাঁরা ভগবানে বিশ্বাস রাখে। রূপকথাধর্মী গল্পের পাঠক শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্ক উভয়েই।

গ) আল্লার সঙ্গে পির, গাজি, বিবির মাহাত্ম্য-কাহিনি রচনা করা কাহিনির মূল উদ্দেশ্য। এর উৎপত্তি হয়েছে আঞ্চলিক পরিবেশে। রূপকথার গল্পগুলি সৃষ্টি হয়েছে বাংলার মা, দিদিমা, ঠাকুমাদের মুখ থেকে। তারাই যুগ যুগ ধরে বয়ে নিয়ে বেড়ায় কাহিনিগুলি।

ঘ) রূপকথাকে বুঝতে গেলে অনুভূতি এবং কল্পনার প্রয়োজন। এগুলির মধ্যে নৈতিকতা খুঁজে পাওয়া যায়। শিশু মনে ভালো ও খারাপের বোধ জন্মায়।

ঙ) বর্তমানে রূপকথাকে সিনেমা, অ্যানিমেশন, সিরিজের মাধ্যমে পরিবেশন করা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় গুপী গাইন বাঘা বাইন, *ঠাকুমার ঝুলি, বেতাল পঞ্চবিংশতি*। পির-গাজি-বিবির মাহাত্ম্যকেন্দ্রিক কাহিনিগুলি পালাগান, যাত্রা, নাটকের মাধ্যমে জনসমাজের সামনে উপস্থাপিত করা হয়।

মান্য সাহিত্যের নিরিখে কেচ্ছাকাহিনিগুলির পর্যালোচনা-য় দেখা যায়- পির-গাজি-বিবিকেন্দ্রিক সাহিত্যগুলি মানুষকে আর নতুনত্বের স্বাদ দিতে পারছিল না। তাই উনিশ শতকে সাহিত্যে নবজাগরণ এলে মানুষ উল্লসিত হয়ে উঠেছে। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন-

> আধুনিক বাংলা সাহিত্যে চণ্ডী, মনসা, বাসুলীর স্থানে মানুষের কথা প্রধান হয়ে ওঠে। দেবতার স্থানে দুঃখনির্ভর মানবজীবনের অশ্রু বেদনার পুলকানুভূতিপূর্ণ বাস্তব কাহিনি উঠে আসে। তবে আধুনিক বাংলা সাহিত্য থেকে দেবদেবীরা দল বেঁধে বিদায় নেন নি। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, গিরিশ্চন্দ্র, এঁদের বেশিরভাগ সাহিত্য পৌরাণিক কাহিনি নির্ভর। সেখানে দেবতাদের উপর মানবধর্ম চাপানো হয়েছে।[১৮]

ধরাবাঁধা একটি গল্পকে কেন্দ্র করে কবিগণ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সমাজলগ্ন মানুষের কথা নিয়ে এসেছেন। এজন্য তাঁদেরকে সচেতন উদ্যোগ নিতে হয়নি। বিভিন্ন কাহিনির নিবিড় পাঠে আমরা জানতে পেরেছি সমাজের সুনির্দিষ্ট কিছু প্রথা ও রীতিনীতি। যেগুলির দ্বারা মানুষের জীবন ও চরিত্র নিয়ন্ত্রিত হয়। সমাজের বাইরে গিয়ে তারা কিছু সিধান্ত নিতে পারে না। সমাজ কী বলবে বা ভাববে সে বিষয়ে সর্বদা সজাগ থাকে। হিন্দুও ইসলাম দুই ধর্মের মানুষের সম্পর্ক, বাঙালি মুসলমানদের পরিচয়, নারীদের দুর্দশা, তাদের সমাজ ও সংস্কৃতির কথা উঠে এসেছে। যুদ্ধ করে কন্যা জয়, ঘর জামাই থাকার রীতি, ভ্রাতৃপ্রীতি, জ্যোতিষচর্চা, অতিথিসেবা,

দিব্যি দিয়ে কথা বলার প্রবণতা, আংটি বিনিময়, পান খাওয়া, বিভিন্ন কুসংস্কার, বিবাহ রীতি, বৈষ্ণব প্রভাব, বধূর বাড়ির মেয়েদের জামাতাকে নিয়ে হাস্যপরিহাস, সতিনকাঁটা, গরিবের দুঃখকষ্টের ছবি ফুটে উঠেছে। অর্থবানদের নিঁচু তলার মানুষের শোষণের চিত্র লক্ষ করা গিয়েছে।

গাজি ও কালু রাজসুখ ভোগ না করে ফকির হয়ে বেরিয়ে পড়েছেন। এই সমস্ত ফকির একসময় সমাজে ছিল। আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া বলেছেন-

> ত্রয়োদশ শতাব্দীর একদম গোড়া থেকে শুরু করে অষ্টাদশ এমনকি ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত উত্তর ভারত, মধ্য এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্য থেকে অসংখ্য ইসলামপ্রচারক পীর-দরবেশ এসেছিলেন বাঙলায়। এঁদের সঠিক সংখ্যা নিরুপণ করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।[৪]

তারা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। তাদেরকে মানুষ আল্লা প্রেরিত দূত ভাবে। সকল সম্প্রদায়ের দীনদুঃখী মানুষকেই তারা নানাভাবে সাহায্য করে। তাদেরকে নিয়ে সাধারণ মানুষের ধারণা খুব ভালো ছিলনা তেমনি তাদের অলৌকিক ক্ষমতাকে বিশ্বাস করেছে। তাই তাদেরকে অনেকেই ভয় ও ভক্তি করেছে।

সুনির্দিষ্ট কাহিনির পরিসমাপ্তি উপন্যাসের মতোই মিলনাত্মক মনে হয়েছে। প্লট যৌগিক এই কারণেই মূল কাহিনিকে শিল্পসৌকর্য করতে এক বা একাধিক উপকাহিনির নির্মাণ রয়েছে। দর্শক মনোরঞ্জনের জন্য মুদ্রিত কাহিনিগুলিতে নাটকীয় উপাদান অনেকখানি রয়েছে। বিভিন্ন ঘটনা, চরিত্র, বিচিত্র নাট্যদৃশ্য ব্যবহারের মধ্যদিয়ে এক প্রকার দ্বন্দ্বমুখর পরিস্থিতি তৈরি করাই উদ্দেশ্য। বিভিন্ন রসের সন্নিবেশ লক্ষ করা গিয়েছে, যেমন- শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীররস।

পির-গাজি-বিবিকেন্দ্রিক কাহিনির পটভূমি কোনো একটি নির্দিষ্ট নয়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পটভূমিতে নতুন একটি কাহিনি গড়ে উঠেছে। গ্রাম বাংলার নদীনালা, গাছপালা, জঙ্গল, মসজিদ, কখনো বা রাজপ্রাসাদের কোনো এক কক্ষে ঘটনা ঘটতে দেখা গিয়েছে।

আড়া, আদ্ধা, ঠেকা তালের উল্লেখের পাশাপাশি ধুয়োর ব্যবহার রয়েছে অর্থাৎ সমগ্র গ্রন্থটি গান করবার উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছে। চমৎকারিতা এবং পাঠক মনে টানটান উত্তেজনা বৃদ্ধি করতে এর ব্যবহার করেছেন। প্রতিবারই কাহিনির বিশেষ মুহূর্তে ধুয়ো ব্যবহৃত হয়েছে।

জহুরানামার ভাষাবৈচিত্র্য, আখ্যানের গঠন বা আঙ্গিকগত দিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। শৈলীতত্ত্বের নিরিখে দেখা হয়েছে বিশেষণ প্রয়োগের বিশিষ্টতা, ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রয়োগ, চিত্রকল্প, অলঙ্কার। আখ্যানরীতির আলোচনায় কথনশৈলীর প্রসঙ্গ এসেছে। সেখানে দেখা গিয়েছে বৈচিত্র্যময় কথনরীতির ব্যবহার। কবির বিবৃতি যেমন আছে তেমনি চরিত্রের মুখেও কবি সংলাপ বসিয়েছেন। ব্যাপক শব্দদ্বৈতের ব্যবহার রয়েছে। যেমন- মনে মনে, একে একে, দিনে দিনে, মিঠা মিঠা। উষ্ণ থেকে ঘৃষ্ট ধ্বনিতে রূপান্তর এবং বিশেষণ পদের ব্যবহার রয়েছে। অলংকার, অনুপ্রাস, বাক্যের সৌন্দর্য সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে। চিত্রকল্পের প্রয়োগে শব্দ নিয়ে ছবি এঁকেছেন কবিগণ। সর্বদা উপমা প্রয়োগের মধ্য দিয়ে পাঠককে তাঁরা বক্তব্য স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন। সমসাময়িক বহু প্রচলিত কথা, মানুষের আচার-আচরণ, রীতিনীতি, সমাজসংস্কার ব্যক্ত হয়েছে প্রবাদের মধ্য দিয়ে। তবে প্রবাদের ব্যাপক প্রয়োগ নেই।

মধ্যযুগীয় সাহিত্য যেমন- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, আরাকান রাজসভার সাহিত্য, বৈষ্ণব সাহিত্য, চৈতন্যজীবনী সাহিত্য, রামায়ণ, মহাভারত নিয়ে ব্যাপক চর্চা হলেও পির-গাজি-বিবির মাহাত্ম্যকেন্দ্রিক সাহিত্য নিয়ে ব্যাপক চর্চা হয়নি। এই গবেষণা নিবন্ধে বাংলা সাহিত্যে সেইটুকু খামতি পূরণের চেষ্টা রয়েছে।

তথ্যসূত্র

১। হক, কাজী রফিকুল, *বাংলা ভাষায় আরবী ফার্‌সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, ২০০৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

২। সেন, সুকুমার, *ইসলামি বাংলা সাহিত্য*, ১৯৯৩, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ.৭৩

৩। দাস, গিরীন্দ্রনাথ, *বাংলা পীর-সাহিত্যের কথা*, ১৯৭৬, শেহিদ লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ১৯

৪। আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া (সম্পা.) *বাঙলা সাহিত্যে গাযী কালু ও চাম্পাবতী উপাখ্যান*, ১৯৯২, সারস্বতকুঞ্জ, কলকাতা, পৃ. ১৮

আকর গ্রন্থপঞ্জি

ওঝা, কৃত্তিবাস, *রামায়ণ,* ২০১৬, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা

খোদা, নেওয়াজ, *পীর গোরাচাঁদ*)প্রকাশকাল অজ্ঞাত), গওসিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা

মজুমদার, শ্রীসুবোধচন্দ্র (সম্পা.), *কাশীদাসী মহাভারত,* ১৯৪৫, প্রবোধচন্দ্র মজুমদার এণ্ড ব্রাদার্স, কলকাতা

সাহেব, আবদুর রহিম, *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি,* মোহাম্মদ নরুল ইসলাম (প্রকা.) ১৩৯৩, ওসমানিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা

সাহেব, আবদুর রহীম, *বোনবিবি জহুরা নামা কন্যার পুথি,* মোহাম্মদ নরুল ইসলাম (প্রকা.) ১৩৯৩, গওসিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা

সাহেব, মরহুম মুনশী মোহাম্মদ খতের, *বোন বিবী জহুরা নামা* (নারায়ণীর জঙ্গ ও ধোনা দুখের পালা), নুরুদ্দীন আহম্মদ (প্রকা.), ১৩৯৪, গওসিয়া লাইব্রেরি, কলকাতা

মুখ্য পত্রিকা

নাগ, ড. রমাপ্রসাদ ও জুলফিকার, এন, *দীপন,* (সত্যপীর, পঞ্চদশ বর্ষপূর্তি সংখ্যা) অক্টোবর ২০১২, লিটল ম্যাগাজিন সংগ্রহশালা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা